বাংলা গণসঙ্গীত ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিকতা

সাগর বিশ্বাস

বাংলা গণসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সলিল চৌধুরি, হেমাঙ্গ বিশ্বাস,বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কিংবা অজিত পাণ্ডে যতটা খ্যাতিমান,রবীন্দ্রনাথ ততটাই অখ্যাত। শতাব্দীকাল ব্যাপী যে রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির চিন্তা চেতনা ও মননের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে, সেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের গণসঙ্গীতে এমন অনুপস্থিত কেন?

এ রকম একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলেলোকগীতি বা লোকসঙ্গীতের সঙ্গে আধুনিক গণসঙ্গীতের স্পষ্ট বিভাজনরেখা মেনেনিয়েই খুঁজতে হবে। নইলে গণসঙ্গীত তো এক অর্থে লোকসঙ্গীতেরই নামান্তর। কারণ 'লোক' বলতে যে জনসাধারণকে বোঝায়'গণ' বলতেও সেই জনগণ। কিন্তু লোকসঙ্গীত বলতেই আমাদের মাথায় আসে জারি, কবি, ভাটিয়ালি, টুসু, ভাদু, কীর্তন, গম্ভীরা বা অষ্টক ইত্যাদির কথা। কখনোই মনে আসেনা 'হেই সামালো ধান হো' কিংবা' পথে এবার নামো সাথি' অথবা 'ওরা জীবনের গান গাইতে দেয়না' এসব গানের কথা। কারণ গণসঙ্গীত বলতেই আমরা বুঝি এ দেশে বামপন্থী বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অঙ্গীভূত সেই সব গান যা মূলত গণজাগরণের জন্য উক্ত আন্দোলনেরই পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রখ্যাত গণশিল্পী হীরেন ভট্টাচার্য্যের মতে, 'মেহনতি জনগণের আন্দোলনের গানই গণসঙ্গীত'। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন'গণসঙ্গীত মাত্রই লোকসঙ্গীত নয়। গণসঙ্গীত কথাটা অনেক বেশি ব্যাপক।... লোকসঙ্গীত সুরে ভঙ্গিতে ও বাক্য বিন্যাসে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ।' পরেশ ধর আরও এগিয়ে বলেন, 'গণসঙ্গীত হবে বর্তমান যুগের ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিচায়ক... শ্রেণীদ্বন্দ্বের এই সবের্বাচ্চস্তরের কথা গণসঙ্গীতে যদি না বলা হয় সমস্ত দেশের লোককে যদি নাসেই সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আকর্ষণ করা যায় তাহলে সেটা গণসঙ্গীত হবেনা'। শুধু তাই নয়, পরেশ ধর একথাও বলেছেন, 'শোধনবাদের বিরুদ্ধে, মন্ত্রী হবার বিরুদ্ধে, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পক্ষে না বললে গণসঙ্গীত হবেনা।'

গণসঙ্গীত বিষয়ে বিস্তর আলোচনা ও অসংখ্য মতামতের মধ্য থেকে আহরিত উপরোক্ত তিন দিকপাল গণশিল্পীর বক্তব্যের মধ্যে তিনটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন আছে (১) এটা শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের গান (২) লোকসঙ্গীতের মতো আঞ্চলিকতার সীমায় আবদ্ধ নয় (অর্থাৎ চরিত্রে আন্তর্জাতিক) এবং (৩) শ্রেণীসংগ্রাম তথা জনযুদ্ধের গান। এই ত্রিবিধ বক্তব্যের নির্যাস ও বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্তযে সাধারণ সত্যে উপস্থিত হয় তা হল, বিশ্বের তাবৎ নিপীড়িত ওশোষিত সাধারণ মানুষের মুক্তি কামী আন্দোলন ও সংগ্রামের গানই হচ্ছে গণ-সঙ্গীত। স্থান ও কাল বিশেষে তার বাণী ও সুরের মধ্যেই যা তারতম্য। এদেশে আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শে সাম্যবাদী আন্দোলন যেহেতু চল্লিশের দশকেই বিস্তার লাভ করে, গণসঙ্গীত কথাটিরও প্রচলন হয় সেই সময়েরবৃত্তে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস জানিয়েছেন ''১৯৪২-৪৩ সনে বাংলার সঙ্গীত জগতে এক নতুন শব্দ শোনা গেল, গণসঙ্গীত।'' হীরেন ভট্টাচার্য্যও

লিখেছেন,''এই সময়েই গণতন্ত্র, জনযুদ্ধ, গণসাহিত্য, গণশিল্প,গণ-নাট্যইত্যাদি কথার সঙ্গে গণসঙ্গীতের নামও শোনা যেতে লাগল।''

এ তথ্য সর্বাংশেই সত্য। চল্লিশের দশকের আগে বাঙলায়'গণসঙ্গীত' বলে কোনো কথাই ছিল না, যেমন ছিল না সত্তর দশকের আগে 'অপসংস্কৃতি'। তাই বলে কি এদেশের মাটিতে শোষণ ও নির্যাতন ছিলনা? তা থেকে মুক্তির কামনা ছিল না? সেই কামনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের কোনোগান ছিল না? সংহতির গান, মানুষকে প্রাণিত, জাগ্রাত করার গান? ছিল। সবই ছিল। ঔপনিবেশিক শাসক শোষণ-ত্রাসনের বিরুদ্ধে এদেশে কম গান হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্বথেকে অসংখ্য মুক্তি কামী গানে 'দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে। মানুষ উদ্দীপিত হয়েছে, সংহত, সংঘবদ্ধ ও আন্দোলনমুখী হয়েছে। শুধু 'রেশমি চুড়ি ' ভেঙ্গে ফেলেই ক্ষান্ত হয়নি, 'কারার লৌহকপাট' ও ভেঙেছে।চেতনায় রক্তাক্ত সংগ্রামের জোয়ার টেনে এনেছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত, মুকুন্দ দাস, নজরুল ইসলাম, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সেই সব গানেও জনজাগরণের প্রশ্নটিই ছিল মুখ্য। সেকালে এসব গানকে দেশাত্মবোধক গান, স্বদেশী সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রচয়িতার নাম অনুযায়ী নামকরণও হয়েছে, যেমন অতুলপ্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি, কান্তসঙ্গীত।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করার জন্য যেদুর্জয় গানগুলিকে নিয়ে একদা রবীন্দ্রনাথ পথে নেমে এসেছিলেন, সেগুলিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্মোকে আবদ্ধ হয়েছে। নামকরণ যেমনই হোক না কেন, সেইসব গানও ছিল বস্তুত গণের গান, গণচেতনার গান, জনগণের আশা আকাঙখা ও আন্দোলনের গান। মানুষের মধ্যে সংহতি ও উদ্দীপনা সঞ্চারের গান হিসেবে অনেক নাম না জানাগায়কের লোকগীতি বা লোকসঙ্গীত ও ছিল। গণসঙ্গীত কথাটি তখনো আমাদের শব্দভান্ডারে অনুপ্রবেশ করেনি। কিন্তু ওইসব গানের কর্ষিত উর্বর জমিতেই উদ্ভূত হয়েছে বাঙলার গণসঙ্গীত। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভাষায় ''একদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুল প্রসাদের ঐতিহ্যবাহী স্বদেশী সঙ্গীতের ধারা অন্যদিকে সিপাহী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ ও বাংলার লোক কবিদের 'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করল এবার ছারখার', 'একবার বিদায় দে মা ঘুরেআসি' প্রভৃতি গানের বলিষ্ঠ ঐতিহ্য- এই দুই ধারার সঙ্গম স্থলে জন্ম নিল গণসঙ্গীত।''

আমরা জানি ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দুটি সুরের ধারা যুগ যুগ ধরে প্রবহমান। একটি ক্ল্যাসিক্যাল, অন্যটি লৌকিক। ক্ল্যাসিক্যাল বলতে শুধু ধ্রুপদী খেয়ালমাত্র বোঝায় না। যে অসংখ্য রাগ ও রাগিনী নানান ভাবে আমাদের লোক-সুর ও লোক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তাদেরও বোঝায়। বাঙলা গণসঙ্গীত শুরু থেকেই সর্বতো ভাবে না হলেও সুরের এই দ্বিস্রোতা ঐতিহ্যকে মোটামুটি পরিহার করে চলেছে। সেখানে পাশ্চাত্যের কয়ার ধর্মী সুর ও ধাঁচ ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপকভাবে। এর কারণ সম্ভবত, এইযে, গণসঙ্গীত বিষয়টিই ছিল মূলত আন্তর্জাতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত। মার্কসবাদ বস্তুটি যেমন তার উৎসভূমি ইওরোপ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, গণসঙ্গীতের ধারণা ও প্রয়োগের ব্যাপারটিও তেমনি আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টির হাত ধরে

দেশে দেশে প্রবেশ করেছে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কাগজে কলমে কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে ঘোষিত না হলেও তার সমস্ত কর্মসূচীই, প্রকৃতপক্ষে, নির্মিত হত পার্টি প্রদর্শিত পথে।

আমরা যারা চল্লিশের দশকে জন্মেছি তারা তখনকার কমিউনিষ্ট আন্দোলন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দেশব্যাপী কর্মকান্ড 'নবান্ন'র অভূতপূর্ব সাফল্য, এসব কিছুই চাক্ষুষ করিনি। কিন্তু ষাটের দশকের উত্তাল গণ আন্দোলন দেখেছি। গ্রামাঞ্চলে বাস করেও সে সময় প্রবল উৎসাহে ভবানী সেন, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সোমনাথলাহিড়ী, জ্যোতি বসু, ইলা মিত্র, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনেছি। শুনেছি অপূর্ব মজুমদার, কমল গুহদের ভরাট গলার প্রদীপ্ত ভাষণ। কোথাও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গভঙ্গ অস্বীকার করার বজ্রনির্ঘোষ। কিন্তু দেখেছি সেইসব সভা এবং ছাত্র সমাবেশে গাওয়া গানগুলিতে আন্তর্জাতিকতার সুর যতটা প্রবল থাকত দেশীয় সুর ততটাই দুর্বল, অবহেলিত।

ওই ষাটের দশকেই কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়েছে, গণসংগঠন গুলিও পৃথক হয়ে গেছে, শোধনবাদ মাথা তুলেছে, পারস্পরিক বিশ্বাস শিথিল হয়েছে, গান কিন্তু থেমে থাকেনি। যে কোনো মিটিং মিছিল সমাবেশ তা সি. পি. আই কিংবা সি.পি. আই. (এম)-এর হোক গণসঙ্গীত তারস্বরূপে উপস্থিত থেকেছে- দেশীয় সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য না মেনেই। অনন্ত চক্রবর্তীর কথায় ''পশ্চিমবঙ্গের গণসঙ্গীত দীর্ঘকাল ধরে আমাদের ক্লাসিক্যাল ধারাকে অবহেলা করে এসেছে।'' শুধু ক্লাসিক্যাল ধারাই নয়, লৌকিক ধারাটিকেও সে আত্মস্থ করতে পারেনি। ''গণনাট্যসংঘের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বহু সার্থক লোকসঙ্গীত শিল্পীর জন্ম'' হতে পারে, যেমন নির্মলেন্দু চৌধুরি, কিন্তু সেধারা গণসঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়না।

এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা। জনচেতনা ওআন্দোলন সংহত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে গানগুলি রচনা করেছিলেন তা কিন্তু দেশীয় সুর-বর্জিত ছিল না। একথা সবাই জানেন যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরের প্রধান অবলম্বন রাগসঙ্গীত, যা প্রথম জীবনেই কবি আয়ত্ব করেছিলেন। পরবর্তীকালে নানাবিধ গানের সংস্পর্শে এসে বাঙলার লোকায়ত সুরগুলিকেও পরম আগ্রহে গ্রহণ করেছেন। শিলাইদহ, সাজাদপুরের দিনগুলিতে গগন হরকরা, লালন ফকিরের গানও তাঁকে তীব্র আর্কষণ করেছে।'' এমন বাউলের গান শুনেছি ভাষার সরলতায়, ভাবের দরদে, তার তুলনা চলে না। তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তি রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনা''বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু যৌবনকালে মনের গভীরে এই বাউল সঙ্গীত প্রভাব ফেললেও নিজের গানে সে সুরের প্রয়োগ ঘটেছে অনেক পরে। তাঁর গানে লোকসঙ্গীতের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়। এই আন্দোলনে কবি প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে যুক্ত করেন এবং সেই দুর্জয়গানের বাণী নিয়ে নেমে আসেন রাস্তায় 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। একই সময়ের বৃত্তে রচিত হয়, 'ও আমার দেশের মাটি', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,' 'তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে,''নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে',যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক','আমার

সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' ইত্যাদি ২৪ খানা গান যা আজও মানুষের প্রাণের গভীরে স্থায়ী আসন পেতে আছে।

এ প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ ''... রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের উপর। এটাই রবীন্দ্রনাথের শক্তি । আমরাওতো গণনাট্যের গান লিখেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী গানের ভেতর দিয়ে যতটা মাটির কাছাকাছি গিয়েছেন আমরা কি ততটা যেতে পেরেছি? ... যেমন বাণী তেমনতার সুর --একদম বাংলার মাটির বুক চিরে নিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। এটা রবীন্দ্রনাথ সম্ভব করতে পেরেছিলেন তার একমাত্র কারণ আমাদের দেশের লৌকিক সংগীত ঐতিহ্যের ধারাটিকে তিনি নতুন বক্তব্যে হাজির করে গেছেন।'' এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেশীয়মাটির সুর গ্রহণ করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত একদিন মানুষকে মাতিয়ে দিয়েছিল, যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আজও কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান', 'ওরে নূতন যুগের ভোরে','জয় হোক জয় হোক নব অণোদয়', 'বাঁধ ভেঙে দাও','খরবায়ু বয় বেগে', 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান','ব্যর্থপ্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' ইত্যাকার অজস্র গান এখনও শিহরণ জাগায়। সে একক কণ্ঠেই হোক, আর সমবেত কণ্ঠেই হোক।

সুচিত্রা মিত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে মধ্য চল্লিশের দশকে অর্থাৎ গণনাট্য আন্দোলনের একেবারে প্রাথমিক পর্বে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের যে সব গান গাইতেন সেগুলি জনগণের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে তুলতো। তাঁর নিজের কথায় ''আই.পি. টি. এ-তে থাকার সময় বিভিন্ন মিটিং-এ, জমায়েতে, অনুষ্ঠানে আমি কিন্তু মূলত রবীন্দ্রনাথের গানই গেয়েছি। বহু সভায় গেয়েছি 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'।দেখেছি, কী অসম্ভব ছাপ ফেলে এই গান মানুষের মনে।''

তাহলে দেখা যাচ্ছে গণসঙ্গীতের সেই উদ্ভব পর্বে রবীন্দ্রনাথের গান যতটুকু গাওয়া হত, জনগণ তাকে সাদরে গ্রহণ করত, প্রত্যাখ্যানের কোনো প্রশ্নই ছিল না। পরবর্তীকালে কিন্তু গণসঙ্গীতের আসর থেকে ক্রমশঃ রবীন্দ্রনাথ অন্তর্হিত হয়েছেন। অথচ এদেশের গণসঙ্গীত বিশারদেরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের বহু গানের সঙ্গে গণসঙ্গীতের স্বধর্মলক্ষ্য করেছেন। যেমন, অনন্ত চক্রবর্তী ''পুরনো স্বদেশী গানগুলিও এক হিসেবে গণসঙ্গীত অথবা গণসঙ্গীতের পূর্বসূরী'' বলেই থেমে থাকেননি, সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন রেখেছেন, 'আমরা পথেপথে যাবো সারে সারে', এই তো গণসঙ্গীত, গণসঙ্গীত আর কাকে বলে?''পীযুষ কান্তি সরকার আরও নিঃসংশয়,''নিষেধ থাকলেও আমি প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে ধরে ছিলাম, আজও আছি।'কেন চেয়ে আছো গো মা, মুখপানে', 'কে এসে যায় ফিরে', 'আমায় বোলোনা গাহিতে', 'সর্বখর্বতারে দহে', 'আগুন জ্বালো','একদিন যারা মেরেছিল', 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি'এবং আরো কত গান গণসঙ্গীত বলেই আমার মনে হয়। তবে গায়ন শৈলীতে বার্তাটা পৌঁছে দেবার একটা তাগিদ থাকা খুবই জোরুরি। 'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে', 'আমরা শুনেছি ঐমাভৈঃ','জয় হোকজয় হোক নবঅণোদয়', - এ কি মানুষকে নিস্তেজ করে, না উদ্দীপিত করে? উদ্দীপিতই করে। প্রকৃতির উপর মানুষ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। তার নানা পরিবর্তন নানাছবিতে ধরে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ কথায়, সুরে। শান্তি এলে, শেষ শোষণ থামলে তখন মানুষ এর প্রেরণায় প্রজ্বলিত এবং উজ্জীবিত হবেন এ ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। তাছাড়া এসব গানের নন্দনগুণ তো শেষ কথা বলেই মনে হয়। প্রকৃত পর্বের

অনেক অনেক গানই গণসঙ্গীত হয়ে উঠতে পারে। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' এমন একটি ফসলের গান, যার তুলনা নেই। 'ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে' আর এক হেমন্তের ফসলের গান হয়ে উঠতেই পারে। বর্ষায় --- 'এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা/ গগনভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা' - একি গণসঙ্গীত নয়?''

উদ্ধৃতিদীর্ঘ হল। কিন্তু উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের বহু গানে সমাজ, জীবন, প্রকৃতি ও স্বদেশ এত মূর্ত হয়ে আছে যে তাকে ইচ্ছে করলেও উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত যায়ওনি। গণনাট্য আন্দোলন তথা গণ সঙ্গীতের সেই উন্মেষপর্বে রবীন্দ্র উত্তরাধিকারের জমিতেই প্রকৃতপক্ষে গণসঙ্গীতের বিকাশ বিস্তার ঘটেছে। হীরেন ভট্টাচার্য পরিষ্কার লিখেছেন, ''গণনাট্যসংঘের জন্মের আগে অর্থাৎ বাংলায় গণসঙ্গীতের উদ্ভবের অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ (জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে) গণসঙ্গীতের ভিত্তি অনেকটাই স্থাপন করে গিয়েছিলেন।'' পুনশ্চ জানিয়েছেন,''তেতাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যেই বাংলা গণসঙ্গীত রূপে, রসে,বৈচিত্র্যে শক্তি মান হয়ে উঠল। সর্বোপরি বিকাশ ঘটল তার বিচিত্র বহুমুখী ক্ষুরধার স্বকীয়তার। এই স্বকীয়তা রবীন্দ্ররস পুষ্ট হয়েও রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র।''বলা বাহুল্য,এই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রই ক্রমে গণসঙ্গীত মঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথকে বহিষ্কার করেছে। যার ফলে ষাটের দশকের উত্তাল গণআন্দোলনের মিছিলে আমরা পীট সীগার কিংবা পলরবসনকে পেলেও রবীন্দ্রনাথকে পাই না। স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য ততদিনে অনেকটাই বৈদেশিকতার ছোঁয়ায় নির্মিত হয়েছে।নৈতিক আনুগত্যের প্রশ্নে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েত না কি চীনকে অনুসরণ করবেসে বিতর্ক প্রকাশ্যে এসে গেছে। সংশোধনবাদের হাত থেকে কমিউনিজমকে বাঁচানোর তাগিদে পার্টি বিভক্ত হয়েছে। দশকের শেষার্ধে নয়া শোধনবাদের অভিযোগে সি.পি.আই. (এম) ভেঙে সি.পি.আই (এম-এল) হয়েছে। এই দল চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যানকেই তার চেয়ারম্যান বলে চূড়ান্ত আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছে। সাম্যবাদী আন্দোলনের এই বহুমুখী আন্তর্জাতিকতার মধ্যে যে গণ সঙ্গীতের অবস্থান সেখানে জাতীয়তাবাদীর বীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়? পীযূষকান্তি একটু রূঢ় ভাষায়বলেছেন,''আমাদের এখানকার গণসঙ্গীত বাজরা রবীন্দ্রনাথকেতো সাম্রাজ্যবাদের দালাল, বড়লোকদের জন্যে গান লিখিয়ে আর সুর করিয়ে, এই তাগা দিয়ে রেখেছিলেন এবং রাখেনও।''

কিন্তু এতটা রূঢ় হবার প্রয়োজন ছিল না কারণ একথা সর্বজনবিদিত যে এদেশের কমিউনিষ্টরা রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল 'বুর্জোয়া কবি' বলে ব্রাত্যকরে রেখেছিলেন। এখনও অনেক 'কমরেড' তোতা পাখির মতো সেইধারণা উদ্‌গীরণ করে চলেন। তাদের কাছে তলস্তয় সম্পর্কে লেনিনের কিংবা বাল্‌জাক সম্পর্কে এঙ্গেল্‌সের ধারণার কথা বলা অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথের মতো দেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদী দার্শনিক কবির মূল্যায়ণে এমন ব্যর্থতার কলঙ্ক এ দেশের কমিউনিষ্টরা কোনোদিন মুছতে পারবেন? অবশ্য প্রয়োজনও নেই। কারণ মার্কসবাদ অনড় অটল কোনো তত্ত্বকথা মাত্র নয়। যা সত্য ও সঠিক তা বিলম্বে গৃহীত হলেও ক্ষতি নেই। আর সত্যতো চিরদিনই বিলম্বে প্রকাশিত হয়। এদেশের বামপন্থী মহলে রবীন্দ্রনাথের পূনর্মূল্যায়ন অনেক আগেই শুরু হয়েছে। ইদানিং গণসঙ্গীতের পটভূমিকায় তাঁর গানের আলোচনাও অনিবার্য হয়ে উঠছে। অনিবার্য, কারণ ইতিমধ্যে তথাকথিত অনেক গণসঙ্গীত জনজীবনের অন্তরালে চলে গেলেও স্বদেশি মাটির সুর ও বাণীতে সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের গান জীবনে জীবন যোগ করে দাঁড়িয়ে আছে। এই নিরাবরণ সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে

হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের লোকসঙ্গীত ও রাগ সঙ্গীতের যেপ্রবহমান সুরের ধারা বয়ে চলেছে, গণসঙ্গীতে তার যথোপযুক্ত প্রয়োগের কথা ভাবতেই হবে।

অন্যথায় সেদিনের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে যেদিন বিদেশের স্বীকৃতি আর অভিজ্ঞান পত্র নিয়ে আমাদের গান আমাদেরই অঙ্গন মুখরিত করবে। কারণ এ দোষ আমাদের আছেই। আমাদের সুতো বিলেত গিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারের ছাপ নিয়ে এলেই আমরা খুশি হই। আমাদের প্রতিভা বিদেশে সম্মানিত না হলে আমরা চিনতে পারিনা। ভেরিয়ার এলউইন কিংবা হাটন সায়েবরা না দেখালে আমরা আমাদের আদিবাসীদেরই দেখতে পাই না। সঙ্গীতের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথেরও এই আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কার কথা দিয়েই এ নিবন্ধ শেষ হোক - " আমাদের ধনযখন আমরা ভালো করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলাম না তখন যাহারা পারে তাহারা একদিন ইহাকে নিজের ব্যবসায়ে খাটাইবে, ইহাকে বিশ্বের কাজে লাগাইবার পথে আনিবে। আমাদিগকে সেইদিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পরে গর্ব করিব, আমাদের যাহা আছে জগতে এমন আর কাহারও নাই।" (সংগীতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

সহায়তাঃ
লোকসঙ্গীত ঃ বাংলা ও আসাম / হেমাঙ্গ বিশ্বাস।
গণনাট্যঃ পঞ্চাশ বছর।
জলার্ক ঃ গণসঙ্গীত সংখ্যা ১৯৯৬।
মনেরেখো/সুচিত্রা মিত্র।
রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিন্তা/মনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩শ খন্ড।

পেশাদার লেখক বা সংবাদপত্রের বেতনভূক সাংবাদিক নাহয়েও সুদীর্ঘ চার দশক ধরে সাগর বিশ্বাস লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প,কবিতা, ছড়া, আলোচনা, ভ্রমণকথা, সাক্ষাৎকার, রিপোর্ট ও রিপোর্টাজ। ছোট-বড় সব ধরণের পত্রিকাতেই লেখেন তিনি। নিজেও একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন- 'একুশ শতাব্দী' (আমাদের ওয়েবসাইটেও রয়েছে)। সাহিত্যের কোন একক শাখা নয়, সাহিত্য, সামাজ, নৃতত্ব, রাজনীতি, সঙ্গীত, নাটক, যাত্রা বহুবিধ ক্ষেত্রেই তাঁর কলমের অবাধ প্রবেশাধিকার। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- ছড়াছড়ি কলকাতা, সাত আকাশের তারা (কিশোর গল্প সংকলন), সময়ের শব্দ।